Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 211 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 211 - 218
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ‘রসিক’ উপন্যাস : নৃত্য শিল্পে বিপন্ন নাচনীদের চিত্রশালা

সম্পা সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
Email ID : sampa961@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Endangered dancing girl, Dancing profession, social value, deprived, threatened status, existential crisis, sexual harassment, marginal.

Abstract

Socially, women have been included in the second class since the dawn of civilization. Women have struggled with many obstacles and adversities and have repeatedly sought to advance. But women did not get the ultimate success. He still hasn't made it to the first grade. Rather, she had to struggle for his own existence is still doing so. A terrible disease of present civilization is the degradation of women. Whether indoors or outdoors, women are endangered everywhere. Women are faced with existential crisis in the professional field as well. By abusing women, the current capitalist world is expanding at a terrible rate. Literature talks about the country and time, so such problems of the society have blossomed in the writing style of the writer.

Subrata Mukhopadhyay has highlighted this endangered society in his novel. By depicting the real society through artistic entities, the scars that lie behind the society. In his novel 'Rasik' (1991), he wrote of the lives of the 'Nachni' (Dancing girl) behind the lauded art in the Rasik society. The plight of women engaged in the dancing profession is depicted in perfect with reality. Nachni decked out in various costumes and ornaments entertain the audience by expressing love and lust through dance-songs with Rasiks. Nachni is the main means of making money for a Rasik. They spend their lives doing manual labour day and night in Rasik's house only to meet the needs of sustenance. Nachni does not get a fair price for their labour and are subjected to humiliation, harassment abuse. In the of Rasik's novel, the work of dancing profession, remuneration and the life depicts of the women who are close to this profession, etc, have been shown to portray the threatened status and existential crisis of the dancers.

Discussion

'রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল' দিয়ে নারীর গড়ে তোলা মানবসভ্যতার সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান মূল মনোযোগের বাইরে। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সামাজিকভাবে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীরা বহু বাধা-বিপত্তি এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বারবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত সফলতা নারী পায়নি। সে এখনও প্রথম শ্রেণির হয়ে উঠতে পারেনি। বরং তাকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। বর্তমান সভ্যতার একটি ভয়ানক ব্যাধি হল নারীর অস্তিত্বের সংকট। এর সূত্রপাত আজকের নয়, বহু যুগ পূর্বে পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের সূচনালগ্ন থেকেই সমাজে এই ব্যাধির বীজ বপন করা হয়েছে। যা বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নারীকে নারী করে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজ যে লিঙ্গবৈষম্য নামক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছ, তার ফল নারীকেই ভোগ করতে হচ্ছে। যদিও সমাজ এই বিষময় ফলের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সমাজ নামক রথের অগ্রগতিতে পুরুষ ও নারী দুই চক্রস্বরূপ। সমাজের উন্নতিতে নর ও নারীর সমান অগ্রগতির প্রয়োজন। কিন্তু সর্বকালেই সমাজ নারীর গতিকে রুদ্ধ করতে প্রয়াস করেছে। চলচ্ছক্তিহীন নারী-চক্র নিয়ে সমাজ-রথের অগ্রগতি শূন্য।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান প্রধানত অন্দরমহলে। অন্দরমহলে আবদ্ধ নারী তার ভরণপোষণের বিনিময়ে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়। তবে, আধুনিক যুগে নারী অর্থকরী পেশার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে অন্দরমহলের চৌকাঠ পেরিয়েছে। আবার কখনো বা পরিবারের অসহায়তায় নারী ঝুঁকিপূর্ণ পেশা বেছে নিয়েছে বা তাকে বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কী অন্দরমহল কী বহির্জগৎ সর্বত্র স্থানেই নারী বিপন্ন হয়। এমনকি পেশাক্ষেত্রেও নারীকে অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়তে হয়। নারীকে অপব্যবহার করে বর্তমান পুঁজিবাদী জগতের প্রসার ঘটছে ভয়ানকভাবে। সাহিত্য দেশ-কালের কথা বলে, কাজেই সমাজের এইরূপ সমস্যা সাহিত্যিকের লেখনী ধারায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। যা জনসচেতনতার বার্তা বহন করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'রাঁধার পর খাওয়া আবার খাওয়ার পর রাঁধা' নারীর অন্দরমহলের নির্যাতনের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অত্যাধুনিক যুগে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া নারীর বিপন্নতার নানা ছবি অঙ্কিত হয়ে চলেছে। অন্দরমহল থেকে বহির্জগৎ— সর্বক্ষেত্রে নারীর বিপন্নতার চিত্র প্রাচীন সাহিত্য থেকে আধুনিক সাহিত্যে অঙ্কিত হয়েছে। বিশিষ্ট কথসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৩) তাঁর 'অনুভব' (১৯৯৪) উপন্যাসে কর্মক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হয়ে নারী কিভাবে মাংস-বাণিজ্যের জগতে প্রবেশ করছে, তার ছবি অঙ্কন করেছেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর (১৮৯৪-১৯৮৮) 'আরাবল্লীর আড়ালে' ছোটগল্পে 'পাত্রী' পেশায় নিযুক্ত নারী ধাপীর বিপন্ন জীবনের ছবি দেখিয়েছেন। পেশাক্ষেত্র কিভাবে নারীর জীবনকে অস্তিত্ব সংকটের মুখে ফেলে, তার পরিচয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পাওয়া যায়। তাঁর 'রসিক' উপন্যাসে নাচনী নাচের সঙ্গে নিযুক্ত নারীর বিপন্নতার চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জগতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০-২০২০) স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময় লেখনীগুণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। নিম্নবর্গের অনালোকিত জগতকে প্রাধান্য দিয়ে যাঁরা সাহিত্য রচনা করলেন, তাঁদের মধ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় হলেন একজন অন্যতম কথাসাহিত্যিক। সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিচিত্র ভাবনার নিরিখে এই বিপন্ন সমাজকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। শৈল্পিক সত্তা দিয়ে বাস্তব সমাজের চিত্র অঙ্কন করে তিনি সমাজের অন্তরালে থাকা ক্ষত চিহ্নকে দেখিয়েছেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের যে প্রতিবাদ উপন্যাসের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে, তা 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করায়। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হওয়া তাঁর প্রতিবাদের সুর—

> "আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।"[১]

সমাজের 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল' নিয়েই সুব্রত মুখোপাধ্যায় আমৃত্যুকাল সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'রসিক' (১৯৯১) উপন্যাসে সাবেক মানভূমের রসিক সমাজে নন্দিত শিল্পের আড়ালে থাকা নাচনীদের জীবনযন্ত্রণার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালে কলকাতার নান্দীকার নামে এক স্বনামধন্য নাট্যগোষ্ঠী 'রসিক' উপন্যাসটি 'নাচনী' নামে মঞ্চস্থ করে। এই উপন্যাসের জন্য ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বঙ্কিম পুরস্কার' লাভ করেন। সমগ্র উপন্যাসটি ঊননব্বইটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। সাতের দশকে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'লাঠি' ছোটগল্প পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল।

তবে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রসিক' উপন্যাস তাঁকে সফলতার চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত করেছে। 'রসিক' উপন্যাস তাঁকে রসিক সাহিত্যসমাজ এবং পাঠকসমাজে 'রসিক সুব্রত' নামে পরিচিতি দেয়।

'রসিক' উপন্যাসটির পটভূমি হল প্রশাসনিক মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাওয়া মানভূম (বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ধানবাদ ইত্যাদি স্থান)। এই উপন্যাসে সাবেক মানভূমের রসিক-নাচনীর জীবন-আলেখ্য বিস্তৃত পরিসরে মহাকাব্যের আকারে স্থান পেয়েছে। ভ্রমণবিলাসী লেখক ভ্রমণ করতে করতে পথে যা কিছু সংগ্রহ করেছেন, তাকেই সাহিত্য জীবনের চলার পথে পাথেয় করেছেন। সাবেক মানভূম-পুরুলিয়ার রসিক সমাজে ভ্রাম্যমান লেখক অনালোকিত সমাজকে দেখেছেন এবং 'রসিক' (১৯৯১) উপন্যাসে সেই অনালোকিত সমাজকে উপস্থাপন করেছেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাঁকে পুরুলিয়ার রসিক-নাচনী সমাজ নিয়ে লিখতে বললে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি পুরুলিয়া যাত্রা করেন। সেই স্থানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—

> "কতক ভূতে পাওয়া গতিকে ঘুরে বেড়াই ঝালদা, মিশিরডি... পাগরোখটঙ্গা এমনই সব গ্রাম।... এই রকম ঘুরতে ঘুরতে দেখা পাই কত সব স্বপ্নলোকের মানুষের। নারী এবং পুরুষ। দেখা পাই পাণ্ডবকুমারের, তরণী সেন, ধ্রুবকুমার, কার্তিক, রাজবালা, সিন্ধুবালা, দুলালী ইত্যাকার কিন্নর-কিন্নরিদের।"[২]

বাস্তবের সঙ্গে নিখুঁত সাদৃশ্য রেখে নাচনী নাচের সঙ্গে নিযুক্ত নারীর বিপন্নতা 'রসিক' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। গবেষক সুব্রতকুমার মল্লিক তার 'নাচনী রসিক প্রসঙ্গ' (২০০৫) গ্রন্থে নাচনীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে —

> "সমাজের নিম্নস্তর থেকে অন্ত্যজ শ্রেণীর কিছু মেয়ে আর্থিক দুরবস্থায়, সামাজিকতার শিকার হয়ে, জাতপাতের প্রাবল্যে কুল হারিয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে একজন রসিকের নিকট আশ্রয় নেয়। সেখানে সে ঝুমুর গীত ও নৃত্য শিখে রসিকের সঙ্গে বিভিন্ন আসরে অবতীর্ণ হয়। রসিক তাকে সিন্দুর পরিয়ে নাচনীতে পরিণত করে। রসিক গৃহে সে রক্ষিতার মত পালিত হয়— মানভূমি অঞ্চলে এই নৃত্য ব্যবসায়ীদের আঞ্চলিক ভাষায় লাচনী বা নাচনী বলে।"[৩]

নাচনী সম্প্রদায়ের প্রধান বিচরণ স্থান পুরুলিয়া হলেও ঝাড়খণ্ড, বিহার, হাজারিবাগ, গিরিডি এবং উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী গ্রামীণ এলাকায় নাচনী প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আদিম সভ্যতা থেকে বর্তমান সভ্যতার বিনোদনের এক অন্যতম মাধ্যম হল নৃত্য। এই নৃত্য পরিবেশনকে অবলম্বন করে নাচনীদের উৎপত্তি। নাচনীদের উৎপত্তির পিছনেও রয়েছে কিছু সংখ্যক নারীলোলুপ পুরুষের লালসাবৃত্তির চরিতার্থতা। মন্দিরে দেবতার বিনোদন কর্মে উৎসর্গীকৃত দেবদাসীরা রাজাদের ভোগ লালাসার শিকার হয়ে মন্দির ছেড়ে রাজমহলের নৃত্যশালায় স্থানান্তরিত হয় এবং নাচনীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে রাজা বিলুপ্ত হলে জমিদারদের বাই-মহলে নাচনীরা স্থান পায়। অবশেষে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটলে অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যে জনসম্মুখে বেরিয়ে আসে। আসরে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকরূপী সাধারণ মানুষদের বিনোদন করাই তাদের কাজ। দেশের মাথা রাজা, সামন্ত প্রভু, জমিদার, বারোভুঁইয়াদের অবসান ঘটলে গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় সাধারণ মানুষের ঘরে নাচনীদের স্থান হয়। 'রসিক' উপন্যাসের নিরিখে নাচনীদের কাজ, পারিশ্রমিক এবং এই নৃত্য শিল্পের সান্নিধ্যে থাকা নারীদের জীবন চিত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে নাচনীদের বিপন্নতা তুলে ধরা হল —

নাচনীদের কাজ : 'রসিক' উপন্যাসের এক অন্যতম চরিত্র রসিক প্রভঞ্জনের দৃষ্টিতে নাচনী হল রসিকের সাধনসঙ্গিনী। আর এই সাধনসঙ্গিনীর কর্মক্ষেত্র দুটি হল —

ক. আসর— রসিক স্বল্প মূল্যে ক্রীত কিম্বা লুণ্ঠিত নারীকে নাচনীতে পরিণত করে এবং আসরে আসরে তাকে পণ্যদ্রব্যরূপে উপস্থাপন করে অর্থ রোজগার করে। এক কথায় বলতে হয়, নাচনী হল রসিকের উপার্জনের একটি মাধ্যম। প্রভঞ্জনের দৃষ্টিতে রসিক 'নাগর কালা' আর নাচনী তার 'প্রেমময়ী রাধারানী'। প্রভঞ্জন 'রসিক' ও 'নাচনী' শব্দ দুটির সঙ্গে যে দুটি শব্দের সংযোগ ঘটিয়ে নাচনীর কাজকে উপস্থাপন করেছেন তা হল- 'পিরীতি' আর 'ঝুমুর'। তার কথায়, 'লাচ, লাগর,

লাচনীই তিন মিলে লাচনী'। কৃষ্ণভাব রসিকের ঝুমুরের প্রেমসঙ্গীতের সুরে রাধাভাবে নাচনীরা নৃত্য পরিবেশন করে। আসর বন্দনা করার পর রসিক যে ঝুমুরের কলিটি গায় নাচনী সেই কলিটি ধরে এবং গানের ফাঁকে ফাঁকে নৃত্য করে। রাধাভাবে নাচনীকে নৃত্যগীত পরিবেশন করতে হয় বলে নাচনীর প্রসাধন এবং পোশাক কিছুটা উগ্র থাকে। নানারকম বেশভূষা এবং অলংকারে সজ্জিত নাচনী রসিকের সঙ্গে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে প্রেম ও কামভাব ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়। ফলত তারা যেমন ভদ্র সমাজের কাছে অচ্ছুৎ বস্তুতে পরিণত হয়, তেমনি আবার দর্শকদের কাছ থেকে তাদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য বর্ষিত হয়।

খ. রসিকের গৃহ— রসিকের পরিবারে রসিকের স্ত্রীর মতোই নাচনীরা গৃহকর্ম করে থাকে। স্ত্রীর মর্যাদা তো তারা পায়ই না, উপরন্তু রক্ষিতার অসম্মান নিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। রসিকের পরিবারে অন্নের হাঁড়ি স্পর্শ করার অধিকার থাকে না। তাদের করনীয় কাজ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

> "সংসারের বাড়তি কাজ পালা করে। কিন্তু কখনো হেঁশেলের হাঁড়ি ছোঁয় না। তার জন্য বরাদ্দ বাইরের কাজ।"[৪]

বাইরের 'বরাদ্দ কাজ' বলতে 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' অর্থাৎ সমস্ত কাজকেই বোঝানো হয়েছে। রসিকেরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে নাচনীদের ফসল উৎপাদনের কাজেও সমান শ্রম দিতে হয়। শুধুমাত্র ভরণ-পোষণের চাহিদাটুকু মেটাতে তারা রসিকের গৃহে দিন-রাত কায়িক পরিশ্রম করে জীবন অতিবাহিত করে। বিনিময়ে রসিকের পরিবার থেকে প্রতি পদে পদে তাদের অসম্মান জোটে। রসিকের নির্যাতনের শিকার হয়ে তাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখেও পড়তে হয়।

নাচনীদের পারিশ্রমিক : আসরে নাচনীর শ্রমই হল রসিকের অর্থ রোজগারের মাধ্যম। রসিক যে বায়নার টাকা পায় বা অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হলে যে অতিরিক্ত অর্থ মেলে, তার কোনোটাই নাচনীরা পায় না। নিশীথ চক্রবর্তী রচিত 'NACHNI, The Dancing Girls of Rural Bengal' (২০০১) এর বঙ্গানুবাদ 'নাচনী' (২০০২) প্রবন্ধধর্মী গ্রন্থে নাচনীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দেখাতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন, বায়না বা অতিরিক্ত টাকার গতি কি হয়—

> "মজা হল এই অর্থের সিকি ভাগ শিল্পীকে তার ভর্তা দিয়ে থাকেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া অনুষ্ঠান চলাকালীন গ্রামীণ দর্শকেরা উৎসাহে এবং মানসিক উত্তেজনা ও আনন্দের আতিশয্যে নিজেদের সামর্থ্য মতো পয়সা টাকা নাচনীদের লক্ষ্যে নিক্ষেপ করেন। ...অথচ এই অতিরিক্ত পাওনার টাকা পর্যন্ত তারা পেয়ে থাকেন না।"[৫]

নাচনী তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায়না। উদ্বৃত্ত অর্থ অর্থাৎ আসরে শিল্প পরিবেশনকালে দর্শকদের দিক থেকে নাচনীর উদ্দেশে যে অতিরিক্ত অর্থ আসে, তার পুরোটাই ভোগ করে রসিক। ফসল উৎপাদনে নাচনী যে শ্রম দেয়, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির পর নাচনীর সেই শ্রমের মূল্য তাকে দেওয়া হয় না। রসিকের বাড়িতে যে, গৃহের কাজ করে তার জন্যও নাচনী কোনো অর্থ পায় না। আসরে, গৃহে এবং কৃষিক্ষেত্রে নাচনী যে শ্রম দেয়, তার বিনিময়ে সে শুধুমাত্র তার ভরণ-পোষণটুকু পায়। গবেষক মিতা ঘোষ বক্সী 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে নাচনীদের যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করেছেন, তা প্রাসঙ্গিক—

> "নাচনী নাচের সঙ্গে যে করুণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতটি যুক্ত তা বাস্তবিকই দুঃখদায়ক। এখন যদি এই আর্থ সামাজিক অবস্থার সুনিশ্চিত পরিবর্তন ঘটিয়ে নাচনীদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে নাচনী নৃত্য শিল্প হয়তো অবলুপ্ত হবে।"[৬]

নৃত্য-শিল্পে নিযুক্ত নাচনীদের বিপন্নতা : 'রসিক' উপন্যাসে দেখা যায়, আর্থিক সংকট থেকে প্রিয়জনদের বাঁচাতে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিক্রি করে নারীরা নাচনী নাচের পেশার জগতে প্রবেশ করেছে। এই উপন্যাসে মালতী, বিজুলিবালা, দুলালী, মঞ্জুরানী, কুসমি এবং নিশারানী প্রমুখ নারী চরিত্র নাচনী নাচের সঙ্গে যুক্ত। এদের মধ্যে মালতী, বিজুলিবালা ও দুলালীর

নাচনী নাচের পেশায় আসার কারণ উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই তিন নারী বিপন্ন হয়ে এই পেশাকে বেছে নেওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছে। এবং প্রবেশ করেছে আর এক বিপন্নতার জগতে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পার্থসারথী ব্যানাজী এবং মধুসূদন মাজী সম্পাদিত 'রসিক ও নাচনী' (২০২১) গ্রন্থে নাচনীদের সম্পর্কে বলা মন্তব্যটি—

> "সমাজে অসহায় নারীরা নানাভাবে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নাচনী জীবন শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। রক্ষিতা বা উপপত্নিই তখন তাঁদের ভাগ্য লিপি।"[৭]

'ভারতের নৃত্যকলা' গ্রন্থে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় নাচনী প্রথার পূর্বরূপ দেবদাসী প্রথায় আসা নারীদের সাতরকম ভাগ করেছেন। যথা- দত্তা, হৃতা, বিক্রীতা, ভৃত্যা, ভক্তা, অলঙ্কারা ও গোপিকা বা রুদ্রগণিকা। এর তিনটি ভাগ 'রসিক' উপন্যাসের নাচনী প্রথায় পরিলক্ষিত হয়। এই তিনটি ভাগ নিম্নরূপ—

ক. হৃতা (লুণ্ঠন করে আনা নারী)— রসিক উপন্যাসে হৃতা নাচনীর উদাহরণ বিজুলিবালা। ভরত সর্দারের কাছে দু'শো টাকায় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হওয়া বিজুলি লুণ্ঠিত হয়ে পাণ্ডবকুমারের নাচনী হয়।

খ. বিক্রীতা (অর্থের বিনিময়ে আনা নারী)— বিক্রীতা নাচনীর উদাহরণ মালতী। কন্যাপণের অভাবে বিয়ে না হওয়া ডোমকন্যা মালতী, মা বিরলার কাছে অতিরিক্ত বোঝা। 'গরিবের পেটের ভুখ মিটান ছাড়া আর কনহ প্রথা নাই' এ কথায় বিশ্বাসী বিরলা নিজের 'ভুখ' মেটাতে দুশো কুড়ি টাকার মূল্যে নাচনীর অনুসন্ধানে রত তরণীসেনের কাছে মেয়েকে বিক্রি করে।

গ. ভক্তা (ভক্তিমার্গযাত্রিণী হবার জন্য স্বেচ্ছায় আসা নারী)— নিজের ইচ্ছায় নাচনী হওয়ার নিদর্শন দুলালী। বিবাহিত দুলালী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত দাদা মতিলাল কুম্ভকারের ঔষধ এবং দাদার পরিবারের হেঁশেল সামলাতে বেছে নেওয়া 'বাজারি পেশা' থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছায় নাচনী প্রথা গ্রহণ করে।

—উপরিউক্ত তিন নারীরই নৃত্য শিল্পে আসার প্রধান কারণ হল অর্থাভাব। এই তিন নারীর মধ্যে মালতীর নাচনী নাচের জগতে আসা হয় না। তরণীসেনের বাবা গুলঞ্চকুমার ডোমকন্যা মালতীকে নাচনীরূপে অস্বীকার করলে, বায়না হয়ে যাওয়া মালতী তার পূর্ব স্থানে ফিরে যায়। বাকি বিজুলি ও দুলালীর নাচনী হয়ে ওঠার মহড়া চলে।

ভরত সর্দারের ঘরে রক্ষিতারূপে থাকা বিজুলিকে লুঠ করে, রসিক পাণ্ডবকুমার নাচনীর অভাব পূরণ করা হয়। রসিক পাণ্ডবকুমারের ঘরে লুণ্ঠিত বিজুলির আশ্রয় হয় নাচনী রূপে। লুঠেরা জঠু সহিসের কাছে লুণ্ঠিতা নারী বিজুলির মতামতের কোনও মূল্য নেই। জঠু সহিস তার লুঠ করা সম্পদ বিজুলিকে রসিক পাণ্ডবকুমারের ঠাকুরদা ভীম মাহাতোর হাতে তুলে দিয়ে বলে— 'লাও কর্তা। লিজের দব্য লিজে দেখ বুঝ করে লাও।' অগত্যা অসহায় বিজুলিকে এই পেশা মেনে নিতে হয় এবং নাচনী হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বে বেশ কয়েকবার পাণ্ডবকুমারের বাবা ধ্রুবকুমারের যৌন আকাঙ্ক্ষার শিকার হতে হয়। রসিক প্রভঞ্জনের ঘরে নাচনী হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বে দুলালীকেও প্রভঞ্জন পুত্র বদনের যৌন আকাঙ্ক্ষার শিকার হতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গবেষক মিতা ঘোষ বক্সী 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে নাচনী নাচের পেশায় নারীর বিপন্নতার রূপটি—

> "নাচনী কথাটির মধ্যে এক অশ্লীলতার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। সমাজে এদের কেউ ভালো চোখে দেখে না। সামাজিক ভাবে এরা কিছু পুরুষের লালসার শিকার হন। জীবনযাপনের ধারা খুবই করুণ দুর্বিষহ চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যায় না। ভারতীয় নৃত্য শিল্পের আঙ্গিনায় এখনও এরা নিন্দিত ও ব্রাত্য।"[৮]

'রসিক' উপন্যাসের অপর এক নারী কুসমি হল ধ্রুবকুমারের নাচনী। এই কুসমির জীবন চিত্রণের মধ্যে দিয়ে নাচনী প্রথায় নারীর বিপন্ন মান-মর্যাদা এবং অস্তিত্বের সংকটের চিত্র দর্শিত হয়েছে। কুসমির নাচনী হওয়ার কারণ উপন্যাসে উল্লেখ নেই। তবে, নৃত্য শিল্পের মধ্যে নিজেকে সমর্পণের উল্লেখ আছে। সে রসিকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেও পরিবারের সদস্যদের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। রসিকের সন্তানদের কাছে সে 'নাচনী মা' আর অন্যদের কাছে নাচনী। একটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 211 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিবারে থেকেও সেই পরিবারের একজন হয়ে উঠতে না পারার যন্ত্রণা অন্য এক নাচনী মঞ্জুরানীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে— 'লাচনীর লেগ্যে সমসারে আসল কিছুই নাই। সবই ঝুটা।' আসরে এবং গৃহে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে কুসমি অপমান এবং লাঞ্ছনার শিকার হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে রসিক ধ্রুবকুমারের দিক থেকে বর্ষিত হয় 'তুঁ থাম শালী। তুঁ লাচনী, লাচনীর পাড়া থাক' ইত্যাদি অপমানজনক বাক্যবাণ। সমালোচক সুব্রতকুমার মল্লিকের 'নাচনী রসিক প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পরিচায়িকা অংশে বরুণকুমার চক্রবর্তী রসিকের পরিবারে নাচনীদের স্থান সম্পর্কে বলেছেন—

> "নাচনীর উপার্জনেই মুলতঃ রসিকের সংসার চলে, অথচ রসিকের রসুই গৃহে কিংবা ঠাকুর ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ। অর্থাৎ স্বামী সন্তান নিয়ে নারী জীবনকে সার্থক করে তোলা তাঁর কপালে নেই।"[৯]

নারীলোলুপ ধ্রুবকুমার বিজুলিকে আক্রমণ করলে নাচনী কুসমি নিজের জীবন বিপন্ন করে বিজুলিকে বাঁচিয়েছে। অসহায় নাচনীদের জীবনে তার মালিক রসিকই সর্বস্ব। আর এই অসহায়তাকে হাতিয়ার করে রসিক ধ্রুবকুমার বিজুলিকে পাওয়ার জন্য বিজুলির মনে পাণ্ডবকুমারের প্রতি সন্দেহের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে পুত্রসম পাণ্ডবকুমারের সঙ্গে কুসমিকে অবৈধ সম্পর্কের অভিনয় করতে বাধ্য করে। রসিকের পরিবারে আত্মনিয়োজিত কুসমি পুত্রসম পাণ্ডবকুমারের সঙ্গে তার এই রূপ অধর্ম করার অক্ষমতা প্রকাশ করলে, ধ্রুবকুমারের জবাবে নাচনীর মূল্যহীন জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে—

> "লাচনী কারঅ মা নয়, পরিবার নয়, বিটি নয়। ...লাচনীর লেগ্যে সমসারে অ্যাকটিই ধম্ম। উয়ার রসিকের মান রাখা।"[১০]

উপন্যাসের শেষলগ্নে ধ্রুবকুমার শার্দূলাক্রমে হঠাৎ করে বিজুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, নাচনী-জীবনের চরম বিপন্নতাকে উপলব্ধি করতে পারা অসহায় কুসমির যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

> "লাচনী কারঅ মা লয়, কারঅ পরিবার লয়। ই সমসারে লাচনী কনহ মানুষ লয়। উ অ্যাকটি মানুষের পারা পাথরের ঢেলা। পাথর, পাথর...। মানুষ লয়, পাথর..."[১১]

নাচনী-জীবনের চরম বিপন্নতাকে উপলব্ধি করে পেরে, কুসমি বাঁধের জলে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে জীবনযন্ত্রণার সমাপ্ত করেছে। নাচনী-জীবনে পদার্পণকারী এক নাচনীর প্রাণ এভাবেই ঝরে যায়। এইরূপ নৃত্য শিল্প নাচনীদের জীবনকে শুধুমাত্র প্রান্তিকই করে না, তাদের জীবনকে বিপন্নও করে তোলে। তাদের প্রতি সমাজের যে ঘৃণা, তা অফুরন্ত। মৃত্যুর পরেও সমাজের কাছে তাদের মৃতদেহ অস্পৃশ্য। উপন্যাসে দেখা যায়, প্রহ্লাদ ডোম কুসমির মৃতদেহ মহিষের গাড়িতে দড়ি দিয়ে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, এক পা দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। পার্থসারথী ব্যানাজী এবং মধুসূদন মাজী সম্পাদিত 'রসিক ও নাচনী' (২০২১) গ্রন্থে নাচনীদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "...বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজ পরিত্যক্তা, বিগত যৌবনা, বার্ধক্যের ভারে জর্জরিতা নাচনীরা অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হন। সারাজীবন একটি শিল্পের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ, বয়সকালে অবজ্ঞা, অপমান, বঞ্চনার স্বীকার হন। অবশেষে হয়ত পথের ধারেই তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সমাজের চোখে পতিতার অস্পৃশ্য অশুচি দেহ ঠিক মতো সৎকারও হয়না। শ্মশানে এদের জায়গা হয়না। মোষের গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেহকে কোন নির্জন স্থানে ফেলে আসা হয়, শিয়াল শকুনির ভক্ষণের জন্য।"[১২]

বিজুলি ও দুলালীর নাচনীর প্রস্তুতি পর্বের মাধ্যমে এবং কুসমির নাচনী-জীবনের আলোকে নাচনী নাচের পেশায় নারীর বিপন্নতা এবং তাদের করুণ পরিণতি দর্শিত হয়েছে। উপরোক্ত নাচনী-জীবনের বিপন্নতা আলোচনার মাধ্যমে নাচনী নৃত্য শিল্পে নারীর অস্তিত্ব সংকটের যে দিক উঠে এসেছে, তা নিম্নরূপ—

ক. রসিকরা সমাজের কুলভ্রষ্ট নারীদের সন্ধানে থাকে। কুলভ্রষ্ট নারীর সন্ধান পেলে তাদের রসিক সমাজ লুফে নেয়। কারণ কুলভ্রষ্ট নারীদের অল্প মূল্যে কিনে ক্রীতদাসী করে নৃত্য শিল্পে নিযুক্ত করা সহজ। রসিকেরা এই কুলভ্রষ্ট নারীদের আসরে আসরে পণ্যরূপে উপস্থাপন করে অর্থ উপার্জনের করে।

খ. নাচনীর কাছে রসিকই যেহেতু তার মালিক, সেই কারণে রসিক তাকে দিয়ে অনেক অপরাধমূলক কাজও করিয়ে নেয়। রসিকের কথার অন্যথা হলে নাচনী অপমান, অত্যাচার এবং নির্যাতনের শিকার হয়।

গ. রসিকের বাড়িতে নাচনীর উদ্দেশ্যে যে অলিখিত আইন থাকে, সেই আইন অনুসারে আর আসরে দর্শকের রুচি অনুসারে নাচনীকে চলতে হয়। কোন ক্ষেত্রেই তাদের আবেদন ও অনুভূতির জায়গা থাকে না।

ঘ. নাচনী নাচের সঙ্গে যুক্ত নারী কায়িক শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না। নাচনীরা স্বাবলম্বী জীবনধারণের পরিবর্তে ক্রীতদাসীর জীবন অতিবাহিত করে।

ঙ. রসিকের পরিবারে নাচনীর সুরক্ষার অভাব। রসিক পরিবারের সদস্যদের চোখে 'নাচনী কারো স্ত্রী নয়, কারো মা নয়, কারো কন্যা নয়', নারী বলে সে শুধুমাত্র ভোগ্যদ্রব্য। এই শিল্পে নারী যৌন আকাঙ্ক্ষার শিকার হয়।

চ. রসিক প্রভঞ্জনের কথায় নাচনীরা 'কিন্নরী', 'দ্যাবতা আর মানুষের মাঝামাঝি'। নিছক শব্দগুলোর যতই মাহাত্ম্য থাকুক না কেন, সমাজে নাচনীদের কোন মর্যাদা নেই। আসরে নাচনীর নৃত্য-গীত পরিবেশনের সময় দর্শকদের দিক থেকে উঠে আসে অশ্লীল চিৎকার— 'যা লোভের, লালসার এবং অপমানের।'

গত শতাব্দীতে দেবদাসী প্রথা অর্থাৎ দেবতাদের নাম করে দাসী উৎসর্গের প্রথা নামক শিল্পটি আইনের সাহায্য নিয়ে বন্ধ হয়েছে। যেমন ১৯১০ সালে মহীশূর, ১৯৩০ সালে ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এই দেবদাসী প্রথার একটি বিবর্তিতরূপ নাচনী প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত। দেবদাসী প্রথায় নারীকে নৃত্য-গীত পরিবেশন এবং শারীরিক সেবার মাধ্যমে দেবসেবার আড়ালে নরদেবতা (পুরোহিত, রাজা ইত্যাদি)-র সেবা করতে হত। নাচনী প্রথায় রসিকের কাছে উৎসর্গীকৃত নারী রসিকের শারীরিক সেবা যেমন করে, তেমনি পরিবারের সমস্ত কাজ করে। এছাড়াও আসরে নৃত্য-গীত পরিবেশনের দ্বারা দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে রসিকের রোজগারে তাকে কায়িক শ্রমও দিতে হয়। দেবদাসী প্রথার মতোই নাচনীও একপ্রকার দাসী, ক্রীতদাসী। ক্রীতদাসী প্রথা আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মানভূম-সিংভূম-ধলভূম এলাকার অন্ধকার জগতে আজও নাচনী নাচের সঙ্গে যুক্ত বিপন্ন নারীর খোঁজ পাওয়া যায়। 'রসিক' উপন্যাসে নিশারানী একজন নামকরা নাচনী, যে, কলকাতার রবীন্দ্রসদনে রাজ্যপালের হাত থেকে তার রাজসম্মান পাওয়ার কথা ভীম মাহাতোকে জানায়। তা থেকে বোঝা যায় যে, এই শিল্প রাজ সরকার স্বীকৃত।

নাচনী নাচের শিল্পটি লোকসংস্কৃতির একটি ধারাকে বজায় রাখলেও শিল্পটি নিন্দনীয়। কারণ শিল্পের আড়ালে শিল্পীর যন্ত্রণাময় জীবন লুকিয়ে আছে। গবেষক সুব্রতকুমার মল্লিকের 'নাচনী রসিক প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পরিচায়িকা অংশে বরুণকুমার চক্রবর্তী এই নৃত্য শিল্পে বিপন্ন নারীদের সমাজের মুলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে, তাদের সুন্দরভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলেছেন—

> "নাচনী প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। দারিদ্র্যের জন্য অসহায় মাতা পিতাকে দুগ্ধপোষ্য কন্যাকে যেন চোখের জলে বিক্রী করতে না হয়। এতে যদি নাচনী নাচের অবলুপ্তি ঘটে ঘটুক। কেননা সর্বোপরি মানুষ শিল্প ও সংস্কৃতির থেকেও বড়।"[১৩]

শিক্ষার আলোকে আধুনিক সমাজের আমূল বাহ্যিক পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন শূন্য। নর-নারীর খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের অবসান আজও ঘটেনি। তাই বুঝি প্রতিনিয়ত আধুনিক শিক্ষিত সভ্যসমাজের পরিবারে এবং পরিবারের বাইরে সর্বত্রই বিপন্ন হওয়া নারীর অজস্র সংবাদ মেলে! পেশাক্ষেত্রে নারীর যে বিপন্নতার দিক দর্শিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 211 - 218
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়েছে, সেই বিপন্নতার কারণ অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। তবে নারীর বিপন্নতার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'নারীবিশ্ব' (২০০৮) গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা প্রাসঙ্গিক—

> "নারী যখন বিপন্ন হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তখন বিশ্লেষণে জানা যায়, 'নারী' বলেই সে বিপন্ন। নারী নিপীড়ন নানা ধরনের, কিন্তু তার একটিই কারণ: 'লিঙ্গ' পরিচয়ে সে নারী, তাই সে নির্যাতিত।"[১৪]

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এসে বলার, ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নারী বিপন্নতার হার দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বেড়ে যাচ্ছে ভয়ানকভাবে। এছাড়াও দেশের ছোটো-বড়ো বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, বিজ্ঞাপন, হোটেল এবং রাজনীতি সর্বত্র নারী পণ্যের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। পুঁজিবাদী জগতের প্রসার ঘটাতে প্রতিনিয়ত নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এই ব্যবহার প্রকাশ্যেই চলছে ভয়ংকরভাবে। সাহিত্যের মাধ্যমে নারীর এই অসহায়তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। আধুনিক যুগে চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্রের মাধ্যমে নারীর পরিমণ্ডলের নানা ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু নারীবিষয়ক অন্ধকার চিন্তাধারায় আজও পরিপূর্ণরূপে আলো প্রবেশ করতে পারেনি। তবে মানবসমাজ আশাবাদী, আশা রাখে নারী একদিন তার ন্যায় বিচার এবং যোগ্য অবস্থান পাবে। নারীদের জন্য সুস্থ সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো সৃজিত হবে। আর এর জন্য নারীর প্রতি সমাজের সুস্থ ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। বিপন্ন মানবসভ্যতা আশা রাখে—

"সে-দিন সুদূর নয়-
যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!"[১৫]

Reference:

১. ইসলাম, কাজী নজরুল, 'বিদ্রোহী', সঞ্চিতা, কলকাতা, ডি.এম.লাইব্রেরি, ষষ্টসপ্ততিতম সংস্করণ, মার্চ ২০১৪, পৃ. ৬
২. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'চন্দনপিঁড়ি', কলকাতা, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮১
৩. মল্লিক, সুব্রতকুমার, 'নাচনী রসিক প্রসঙ্গ', কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৫, পৃ. ১২
৪. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'রসিক', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৮
৫. চক্রবর্তী, নিশীথ, 'নাচনী', কলকাতা, সাগ্নিক, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১৩
৬. বক্সী, মিতা ঘোষ, 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি', কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পি এইচ.ডি (আর্টস), ২০০৮, পৃ. ১৩৩ সহায়ক লিঙ্ক- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/223415
৭. দাস, রমানাথ, 'নাচনী নাচের উৎস সন্ধানে', রসিক ও নাচনী (প্রথম খণ্ড), পার্থসারথী ব্যানাজী এবং মধুসূদন মাজী (সম্পাদক), টেরাকোটা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ১০
৮. বক্সী, মিতা ঘোষ, 'পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি', কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পি এইচ.ডি (আর্টস), ২০০৮, পৃ- ২১৩, সহায়ক লিঙ্ক- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/223415
৯. মল্লিক, সুব্রতকুমার, 'নাচনী রসিক প্রসঙ্গ', কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৫, 'পরিচায়িকা'
১০. মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, 'রসিক', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৪০২
১১. তদেব, পৃ. ৬৩৬
১২. চৌধুরী, মলয়, 'নাচনী এক বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি', রসিক ও নাচনী (প্রথম খণ্ড), পার্থসারথী ব্যানাজী এবং মধুসূদন মাজী (সম্পাদক), টেরাকোটা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ১৬২
১৩. মল্লিক, সুব্রতকুমার, 'নাচনী রসিক প্রসঙ্গ', কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৫, 'পরিচায়িকা'
১৪. বেগম, মালেকা, 'বিপন্ন নারী: সতীদাহ থেকে কন্যাভ্রুন হত্যা', নারীবিশ্ব, পুলক চন্দ্র (সম্পাদক), কলকাতা, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৭২
১৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, 'নারী', সঞ্চিতা, কলকাতা, ডি.এম.লাইব্রেরি, ষষ্টসপ্ততিতম সং, মার্চ ২০১৪, পৃ. ৬৭